ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস:

“মনোপলি”-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের দ্যোতনা ১৮৩২-১৯৪৭

সারসংক্ষেপ

(SYNOPSIS)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ইতিহাস বিভাগের অধীনে ডক্টরেট (Ph.D.) উপাধির জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভ

অরুণাংশ মাইতি

পিএইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: A00HI1100617

রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ২৯/১১/২০১৭

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৪

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস:

"মনোপলি"-র প্রতিরোধ থেকে স্বরাজের দ্যোতনা ১৮৩২-১৯৪৭

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের 'মনোপলি' থেকে সাধারণ লবণ কিভাবে স্বরাজের প্রতীক হয়ে ওঠে তা ভারতীয় এবং আরো বিশেষভাবে বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে অনুধাবন করতে হলে সমাজজীবনে লবণের বহুস্তরীয় অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় জনজীবনে লবণের অপরিসীম গুরুত্ব শুধু দৈনন্দিনের খাদ্যাভ্যাস তথা শারীরিক প্রয়োজনেই সীমিত নয়, বরং সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতির বিবিধ মাত্রায় তা প্রতিভাত হয়। সামান্য লবণের সহযোগ যেমন মানুষের ক্ষুধার নিবৃত্তি থেকে রসনার পরিতৃপ্তিতে সহায়ক হয়ে ওঠে, তেমনই তার অভাব সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধিত প্রতীকে পরিণত হতে পারে। ভারতীয় সেনাদের লবণের প্রতি আনুগত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতে, এমনকি বিশ্বের অন্যত্রও, আধিপত্যের ভিত অটুট রাখতে ভরসা জুগিয়েছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতীয় ঐতিহ্যে লবণের - আহার উপকরণ, পুষ্টিবিধায়ক, ঔষধি, পণ্য, প্রতীক সহ - নানাবিধ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়; অথর্ববেদ থেকে উপনিষদ, পুরাণ থেকে ধর্মশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে বাৎসায়নের কামসূত্র, চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে সুলতানি ও মুঘল যুগের দরবারি ও সামরিক সংস্কৃতিতে যার সাক্ষ্য মেলে। ঔপনিবেশিক পর্বে উচ্চবর্গ থেকে উপজাতি মানুষের বিবিধ সংস্কারে, আচার-রীতিতে, ধর্মীয় বিশ্বাসে লবণের উপস্থিতি তথা অপরিহার্যতা তুলে ধরে প্রাচ্যবিশারদ জন অ্যাবট ভারতীয় সমাজজীবনে 'লবণের ক্ষমতা' বা মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন। অন্যদিকে ১৯৩০-এ মহাত্মার সত্যাগ্রহে লবণ যে ভারতীয়দের কাছে হঠাৎ এক রহস্যময় শব্দ, ক্ষমতার দ্যোতক হয়ে উঠেছিল, তা স্বয়ং জহরলাল নেহরুই তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। ভারতীয় প্রেক্ষিতে লবণেতিহাস চর্চার কাঠামোটি অবশ্য অর্থনীতি কেন্দ্রিক, লবণের বস্তুগত দিকটিই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। অর্থাৎ লবণ কিভাবে উৎপাদিত হত, উৎপাদক কে, কিভাবে ও কারা তা পরিবহণ ও বাজারজাত করত, ক্রেতা-ভোক্তাই বা কারা, কিভাবে তা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি এবং মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিল— এই বিষয়গুলিতেই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। সম্প্রতি পরিবেশগত প্রভাবের নিরিখে লবণ ইতিহাসের পর্যালোচনা শুরু হলেও তা অর্থনীতিকেন্দ্রিকতার ধারণাকেই সংহত করে। বলাবাহুল্য যে, লবণের অর্থনীতিকেন্দ্রিক ইতিহাস

গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার পরিধিতে বহুতর প্রশ্নের (যার একাংশ অর্থনীতির অনুষঙ্গেই উঠে আসে) উত্তর মেলে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বার্থেই ভারতীয় উপনিবেশে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যিক আমদানি ও ক্রমিক আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল, এবং তার ফলশ্রুতিতে বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পের ক্রমবিলুপ্তি ঘটেছিল। অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই বিষয়টি বহুচর্চিত হলেও জাত-ধর্ম-বর্ণভিত্তিক বহুস্তরীয় ভারতীয় সমাজে দেশি লবণের পরিবর্তে 'অপর' বিদেশি লবণের উপস্থিতি কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল তা বিবেচিত হয় না। অথচ লবণের মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বর্ণ, আকার, স্বাদ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে কি আবেদন রাখে; বিশেষত ভারতীয় জনরুচিতে কালাপানি পার হয়ে আসা ব্রিটিশ লবণ কিভাবে গৃহীত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে কেন্দ্র করেও সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আবর্তিত হয় এবং 'অপর' সম্পর্কে ধারণায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ [পঞ্চ ইন্দ্রিয়ানুভূতি] গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; অ্যান্ড্রু রটার যাকে 'Empires of the Senses' বলে অভিহিত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানীরাও বৃহত্তর সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত থেকে পণ্যের 'সামাজিক জীবনের' ধারণাকে তুলে ধরে বস্তুর 'সাংস্কৃতিক জীবনীর' প্রয়োজনীয়তার পক্ষে সওয়াল করেছেন। বলাবাহুল্য, পণ্যের সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আজ যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক অর্জুন আপ্পাদুরাইয়ের 'The Social Life of Things'-এর যুক্তি হল: বস্তুসমূহের এক "সামাজিক জীবন" রয়েছে যা তাদের ভৌত অস্তিত্ব অতিক্রম করে সম্প্রসারিত হয়। বস্তু কেবল মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত নিষ্ক্রিয় উপাদান নয়, বরং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও সম্পর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। বস্তু বার্তা প্রেরণ করতে পারে, সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হতে পারে, এমনকি মানুষের চিন্তা এবং আচরণকে প্রভাবিত করে নির্দিষ্ট আকার দিতে পারে। বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে বস্তুর উপস্থিতি বিভিন্ন অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে। ধর্মীয় আচার, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিভিন্ন বস্তু তথা পণ্যের ভূমিকা তুলে ধরে আপ্পাদুরাই, ইগর কপিটফ, ক্রিস বেইলীরা দেখিয়েছেন যে কিভাবে সেগুলি প্রায়শই সামাজিক স্তরবিন্যাস এবং ক্ষমতার কাঠামো তৈরিতে এবং তা শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ভারতের বহুমুখী লবণ সংস্কৃতির নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা যথোচিত গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষিত না হলে লবণের ইতিহাস খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেবা, আনুগত্য এবং সম্মানের ধারণায় লবণের স্থান, রুচি এবং নান্দনিকতার আবহে, প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্ররূপে,

স্বাধীনতা, ভোগবিলাস, দুরবস্থা এবং শোষণের সূচক হিসাবে লবণ সংস্কৃতির বিচিত্র এবং জটিলতর সম্ভাবনার দিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন বলেই ডেভিড আর্নল্ডও মনে করেন।

ঔপনিবেশিক বাংলায় লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াসই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের মূল লক্ষ্য, যেখানে বস্তুর 'সামাজিক জীবন' সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ধারণা সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুসৃত হয়েছে। উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে লবণকে কেন্দ্র করে যে বহুতর অর্থ, তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, এবং সময়বিশেষে তা কিভাবে নৈতিক প্রতিবাদ ও সমষ্টিগত প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল— লবণের সামাজিক সেই রূপান্তরের গতিপ্রকৃতি অনুসন্ধান করাই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভের মৌলিক উদ্দেশ্য। দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের উপস্থিতিই ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে বহুমুখী তাৎপর্য ও প্রতিস্পর্ধী প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেছিল, যার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লবণ যেন সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বিদেশি ব্রিটিশ লবণ যদি গুণমানগত শুদ্ধতা ও শুভ্রতা, স্বাস্থ্যসম্মত, কম দাম ইত্যাদির নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে এবং তার সূত্রে দেশীয় লবণের ঔপনিবেশীকরণ ঘটিয়ে থাকে, তাহলে দেশজ ঐতিহ্য ও নৈতিক মূল্যবোধে জারিত স্বদেশী লবণ কিভাবে প্রতিস্পর্ধী অর্থ ও প্রতিক্রিয়ায় বিদেশি লবণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে নাকচ করে এবং ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত তথা স্বরাজের প্রতীক হয়ে ওঠে— সামাজিক ইতিহাসের চৌহদ্দিতেই তা স্পষ্ট হয়। সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবশ্য বস্তুর 'সামাজিক জীবন' শুধু অতীত নয়, বর্তমান, ভবিষ্যতের দিশায়ও সম্প্রসারিত। ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে লবণকে কেন্দ্র করে যে অর্থ, তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়াসমূহ পরিলক্ষিত হয় সময়ের সাথে সাথে তা কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল, আবার কোনো ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় থেকেছে; এবং তার রেশ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চরিত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিন্নতা থেকেই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে, বস্তুর 'সামাজিক জীবন'কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করে, অতীতের প্রেক্ষিতে লবণের 'সামাজিক ইতিহাস' অনুসন্ধান করা হয়েছে।

'লবণের আমরা-ওরা: দ্বন্দ্বে ও প্রতিদ্বন্দ্বে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ' শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় হল- ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে দেশীয় লবণের 'অপর' রূপে বিদেশি ব্রিটিশ লবণের উপস্থিতি কি তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল, এবং তার পরিণামে লবণ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। বিদেশি লবণের গুণমানগত শুদ্ধতা, শুভ্রতার ও স্বাস্থ্যমানের নিরিখে

শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিভাবে উপনিবেশে শুচিতা তথা শুদ্ধতার ভিন্নতর ধারণায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তা এখানে আলোচিত হয়েছে। লবণের শুভ্রতার ধারণার মধ্যেই পণ্য বর্ণবাদের সাম্রাজ্যিক রেশ কিভাবে প্রকটিত হয়েছিল, অন্যদিকে বিশ্বাস ও আনুগত্যে নির্ধারিত ভারতীয় লবণ সংস্কৃতিতে তা কিভাবে পাল্টা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, তা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। লবণ কিভাবে বাণিজ্যিক-রাজনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল আর উপনিবেশিত মানুষের আহার্যে ও জীবনে লবণের অপরিহার্যতার বিষয়টি কিভাবে গৌণ, প্রান্তিক হয়ে গিয়েছিল তা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট হয়।

১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের লবণ নীতির অভিঘাতে দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তি এবং বাজারে বিদেশি লিভারপুল লবণের রমরমা পরিলক্ষিত হয়, যা অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় 'অবশিল্পায়নের' নিদর্শ রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে অবশিল্পায়নের ফলশ্রুতিতে লবণ কি তাৎপর্য, প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল তার বিভিন্ন মাত্রা **'স্বদেশী পূর্ব লবণ প্রতর্ক: নীতি ও রাজনীতি'** শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। ন্যূনতম নুন বাংলার গ্রামসমাজের স্বয়ম্ভরতায় ও সংস্থানে কি তাৎপর্য বহন করত; করভারের হ্রাসবৃদ্ধিতে নুন বাঙালি মধ্যবিত্তর জীবনে, ভোগের ধারণায় কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল; জাতপাত ও ধর্মীয় সংস্কার সঞ্জাত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদেশি লবণ কি অর্থ বহন করেছিল এবং কি প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছিল; উৎপাদনের অধিকার হারানো মলঙ্গীদের জীবনে নুন কি প্রভাব ফেলেছিল, সর্বোপরি এই প্রভাব-প্রতিক্রিয়াসমূহ কি কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল— এই অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। লবণকে কেন্দ্র করে বিশ শতকীয় স্বদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও তার সামাজিক চরিত্রকে অনুধাবন করতে এই অধ্যয়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের পর্বে লবণ বয়কটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে কিভাবে বিদেশি ও স্বদেশির পার্থক্য নির্ণীত হয়েছিল তা তৃতীয় অধ্যায় **'বয়কটের আহ্বান: স্বদেশি সমাজ ও লবণ-রাজনীতি'**-তে আলোচিত হয়েছে। বিদেশি লবণ বয়কটের কর্মসূচী কিভাবে কার্যকর হয়েছিল, সামাজিক বয়কটের রাজনীতির সাথে তা কিভাবে সংযুক্ত হয়েছিল, বিদেশি লবণে অশুচিতার ধারণাই বা কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা গুরুত্ব সহকারে অনুধাবনের চেষ্ট করা হয়েছে। বিদেশি লবণ বয়কটের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষত দরিদ্র, নিম্নজাতিভুক্ত ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, সাধারণ মানুষের জীবনে নুনের অপরিহার্যতার দিকটি কি ভদ্রলোকের লবণ-রাজনীতিতে স্বীকৃত হয়েছিল, সর্বোপরি, স্বদেশি সমাজে

'দেশীয়' লবণ বলতে কি বোঝাত এবং তার উৎপাদনে কি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এই অধ্যায়ে তলিয়ে দেখা হয়েছে। বিশ শতকে লবণকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির গতিপ্রকৃতি এই অধ্যয়নের প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়।

১৯৩০-এ লবণ আইন অমান্যের সূত্রেই গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে লবণ কিভাবে স্বরাজের প্রতীক হয়ে উঠল তা চতুর্থ অধ্যায় **'গান্ধী ও লবণ: স্বরাজের দ্যোতনা'** শীর্ষক অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। গান্ধীর রাজনৈতিক চেতনায় নুন কিভাবে জায়গা করে নিয়েছিল, গান্ধী এবং গান্ধীবাদীদের জীবনে নুন কি তাৎপর্য বহন করত, বিশেষত স্বাদ, সত্যাগ্রহ, ব্রহ্মচর্যে নুন কিভাবে সংযুক্ত বা সমন্বিত হয়েছিল, স্বরাজের প্রতীক রূপে জনতার কল্পনায় ও জল্পনায় লবণ কি রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সর্বোপরি, সত্যাগ্রহ লবণ কি সাম্রাজ্যিক 'অশুদ্ধি' তথা গুণমান নির্ণয়ের রাজনীতিকে অতিক্রম করতে পেরেছিল — এই প্রশ্নগুলিকে গভীরে তলিয়ে দেখা হয়েছে।

গান্ধীর পদযাত্রা এবং সত্যাগ্রহ কি ভারতের লবণাক্ত পরিসরকে সংযুক্ত হয়েছিল না কি না কি পূর্ববত, দূরেই সরিয়ে রেখেছিল। ১৯৩০ কি সংযোগের মূহূর্ত, নাকি বিচ্ছিন্ন সময় মাত্র? বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে **লবণে স্বরাজ? আইন অমান্য আন্দোলনের পর্বে ও পরে বাংলার উপকূল** শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে। এখানে বাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে সংগঠিত সত্যাগ্রহে লবণ কিভাবে উৎপাদিত, বিক্রয় ও ব্যবহৃত হয়েছিল, সত্যাগ্রহ লবণ উপকূলবর্তী প্রান্তীয় মানুষের জীবনে কি অর্থ, প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল, সত্যাগ্রহের ফলশ্রুতিতে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ কি তাদের লবণ উৎপাদনের অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন, এবং উপকূলীয় বাংলায় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন কি ঘটেছিল তার পর্যালোচনা করা হয়েছে।

লবণের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধানে এখানে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসৃত হয়েছে, এবং সেই বিশ্লেষণ ও যৌক্তিক কাঠামোর সাথে সাযুজ্য রেখে জ্ঞানচর্চার অন্যান্য শাখার তাত্ত্বিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশেষত, লবণেতিহাসের নানান মাত্রা- যথা, স্বাদ, গুণমানগত শুদ্ধতা, শুভ্রতায় প্রতিভাত পরিচ্ছন্নতা, ধর্মীয় শুচিতা ইত্যাদির পাশাপাশি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের - প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পণ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধানই যেহেতু এখানে মুখ্য, তাই আন্তর্বিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary method) ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এই গবেষণায় উপযোগী হয়েছে।

এই সন্দর্ভের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ও তার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনুসন্ধানের উত্তর দিতে গিয়ে যে আর্কাইভটি গড়ে উঠেছে তা নানা দিশায় সম্পসারিত। লবণ কিভাবে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হয়ে উঠল তা বুঝতে গিয়ে অর্থনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত রেভেনিউ রেকর্ডস ও পার্লামেন্টারি পেপারস-এর পাশাপাশি অষ্টাদশ থেকে বিশ শতকের ভারতীয় ও ব্রিটিশ সহ আন্তর্জাতিক লেখকদের গ্রন্থ, সংবাদপত্রগুলি প্রভৃত তথ্য জুগিয়েছে। করভার জনিত লবণ বঞ্চনাকে ঘিরে সাধারণ ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ, এবং অবৈধ লবণ উৎপাদন করে উপকূলের গ্রামবাসীদের ধারাবাহিক লবণ আইন অমান্য প্রসঙ্গে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি, পুলিশি প্রতিবেদনই মুখ্য উপাদান হয়ে উঠেছে। উনিশ ও বিশ শতকের বহু সংবাদপত্র কালের গর্ভে হারিয়ে গেলেও সরকারি নজরদারির প্রতিবেদন 'রিপোর্ট অন নেটিভ পেপারস ইন বেঙ্গল' (১৮৭৬-১৯১৬) গুরুত্বপূর্ণ আকর হয়ে উঠেছে। স্বদেশি পর্বে লবণকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বহুমাত্রিকতা অনুধাবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে হোম পাবলিক ও হোম পলিটিক্যাল প্রসিডিংস থেকে আহৃত পুলিশ রিপোর্ট ও গোয়েন্দাদের গোপন প্রতিবেদন, বেঙ্গল কোডের মতো আইনি সংকলন। ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ কেন্দ্রিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের নানান মাত্রা অনুসন্ধানে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ রেভেনিউ রেকর্ডস এবং রাজদ্রোহে বাজেয়াপ্ত পুস্তকের (proscribed literature) পাশাপাশি গান্ধীর কালেক্টেড ওয়ার্কস এবং আশ্রমিক-অনুগামীদের তাঁকে লেখা চিঠি বা পরবর্তীকালের স্মৃতিকথা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। আইন অমান্য আন্দোলন পরবর্তী পর্বে লবণ প্রসঙ্গে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসন্ধানে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি ও বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ডিবেটস-এর সংকলন ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় দেশীয় লবণ শিল্পোদ্যোগের ব্যক্তিগত বেসরকারি প্রয়াস সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির নথিপত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

লবণের সামাজিক ইতিহাস রচনা – বিশেষত, বিদেশি ব্রিটিশ লবণ ও 'মনোপলি'-র বিরুদ্ধে বিবিধ প্রতিক্রিয়া থেকে 'স্বরাজের' প্রতীক হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা – বঙ্গীয় পটভূমিতে বহুমাত্রিক ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক পর্বে কোম্পানির সল্ট মনোপলির সূচনা যেমন আঠারো শতকের বাংলায়, তেমনি উনিশ শতকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত সাক্ষ্যতে লিবেরাল, মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক রামমোহন বাংলায় বিদেশি লিভারপুল লবণের বাণিজ্যকে স্বাগত জানয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ রাজের সূচনায় দেশীয় লবণ শিল্পের বিলুপ্তি, এবং বিশ শতকে স্বদেশী আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের

প্রেক্ষিতে লবণকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিবিধ মাত্রাও নিদর্শ বাংলায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। গান্ধী স্বয়ং লবণ কর কিভাবে বাংলার মানুষকে "লুণ্ঠন" করেছিল, উৎপাদনের অধিকার থেকে অনৈতিকভাবে বঞ্চিত করেছিল এবং বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস করেছিল সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছিলেন। নিজস্ব ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যেই বাংলা লবণের সামাজিক ইতিহাস গবেষণার অন্যতম পটভূমি হয়ে ওঠে।

এই অধ্যয়নের সূচনা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, যখন লিবেরাল মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী রাজা রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটিতে প্রদত্ত লবণ সাক্ষ্যে ভারতে ব্রিটিশ লবণের বাণিজ্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। লবণ বাণিজ্য সহ বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে সেই প্রথম কোনো বাঙালি তথা ভারতীয়র স্বাক্ষ্য গৃহীত হয়েছিল; সর্বোপরি ভারতীয়দের স্বার্থে তথা হিতার্থে যে ব্রিটিশ লিভারপুল লবণের বাণিজ্য কাম্য এমন মতাদর্শগত সাম্রাজ্যিক দাবিতে 'শাসিতের সম্মতি' আদায়ের দৃষ্টান্তও এটি। অন্যদিকে অধ্যয়নের সমাপ্তিকাল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশিত হয়েছে। ১৯৩০-এ গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ স্বরাজের প্রতীক রূপে গণ্য হয়েছিল। লবণে স্বরাজের ধারণা কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছিল তার পর্যালোচনায় আইন অমান্য আন্দোলনের পরবর্তী পর্বে উপকূলীয় মানুষের লবণ উৎপাদনের অধিকার, সরকারের লবণ নীতি, দেশীয় লবণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি প্রসঙ্গে ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময়কাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। লবণের প্রতীকী ধারণা ও বস্তুগত বাস্তবিক ধারণার মধ্যে বেণীবন্ধন ঘটেছিল না ভিন্ন অভিমুখে গিয়েছিল তা এই সময়পর্বের আলোচনায় অনুধাবন করা যায়।

Sudeshna Banerjee
25.11.2024

Arunangshe Maity
25.11.2024